# ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি: গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

النظرة الإيجابية وأهميتها في حياة الإنسان

< بنغالي >

আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

عبد الله شهيد عبد الرحمن


৪০৩


সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

مراجعة: د/أبو بكر محمد زكريا

## ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি: গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

যদি এমন একটি গ্লাস থাকে যার অর্ধেকটা পানি দিয়ে ভর্তি আর অর্ধেকটা শূন্য তাহলে এটাকে দু'ভাবে মূল্যায়ন করা যাবে।

এক. ইতিবাচক মূল্যায়ন। অর্থাৎ বলা হবে যে, গ্লাসটি অর্ধেকটা পূর্ণ। গ্লাসটি খালী নয়। আর এ অর্ধগ্লাস পানি মানুষের জন্য উপকারী।

দুই. নেতিবাচক মূল্যায়ন। যেমন বলা হবে গ্লাসটির অর্ধেকই খালি, অপূর্ণাঙ্গ আর এ অর্ধগ্লাস পানি দিয়ে কি-ই বা হবে।

প্রতিটি ব্যক্তি, ঘটনা ও কর্ম মূল্যায়নকালে এভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টভঙ্গি আপন করে নেওয়া যায়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমার আলোচনার বিষয় হল, ইসলাম আমাদেরকে কোন ধরনের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আপন করতে উৎসাহ দেয়? ইতিবাচক মূল্যায়ন নাকি নেতিবাচক মূল্যায়ন?

ইতিবাচক মূল্যায়ন মানুষকে উৎসাহ যোগায়, উদ্দীপনা দেয়, সামনে এগুতে সাহস যোগায়, যা মানুষকে উপকার করে তা অর্জন করতে শেখায়, ধৈর্যধারনে উৎসাহ দেয়, মানুষের মধ্যে সৃজনশীলতা ও আবিস্কারের মানসিকতা সৃষ্টি করে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, অন্যকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে।

নেতিবাচক মূল্যায়ন মানুষকে নিরুৎসাহিত করে, হতাশ করে, অলস হতে সাহায্য করে, ধৈর্যহীন করে তোলে, নৈরাশ্যবাদের জন্ম দেয়, অন্যের প্রতি হিংসা, পরনিন্দা ও অবমাননা ইত্যাদিতে উৎসাহিত করে।

ইসলাম তার অনুসারীদের কাছ থেকে সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কামনা করে। এর উদাহরণ হিসেবে কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য দৃষ্টান্ত থেকে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরছি।

**প্রথমত: কুরআন থেকে:**

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে বলেন,

﴿وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا بَٰطِلٗاۚ ﴾ [ص: ٢٧]

“আর আমি আকাশ ও পৃথিবী ও -এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা অনর্থক সৃষ্টি করি নি।” [সূরা সাদ, আয়াত: ২৭]

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে আমরা দেখলাম যে তিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে তার বান্দাদেরকে দিয়েছেন ইতিবাচক ধারণা; তার সৃষ্টির কোনো কিছুই অনর্থক নয়। প্রতিটি বস্তু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট। আমরা পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেই মন্তব্য করে থাকি যে, কেন যে আল্লাহ এ বিষয়টি সৃষ্টি করলেন? সৃষ্টিবস্তুতে স্থিত ইতিবাচক দিকগুলো বুঝে না আসার কারণে আমরা এ জাতীয় প্রশ্ন করে থাকি। কুরআনের দাবি অনুযায়ী এ রকম

মন্তব্য করা বা ধারণা করা অশুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা সে সকল ঈমানদারদের প্রশংসা করেছেন যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا﴾ [ال عمران: ١٩١]

"যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে, বলে, হে আমাদের রব আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেন নি।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯১]

এ আয়াতে আমরা দেখলাম যে, আল্লাহ তার ঐ সকল বান্দাদের প্রশংসা করেছেন যারা সকল সৃষ্টি সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে।

তিনি আরো বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا﴾ [البقرة: ٢٩]

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদের কল্যাণের জন্য।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৯]

আল্লাহ তা'আলার এ রকম বাণী রয়েছে কুরআনের বহু স্থানে। এ সকল আয়াত দিয়ে তিনি পৃথিবীর সকল সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে এত পছন্দ করেন যে, একটি নেতিবাচক বিষয়কে শুধু বাদ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন না; বরং তিনি সেটিকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে ইতিবাচকে পরিণত করে দেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠﴾ [الفرقان: ٦٩]

"তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৯]

দেখুন এ আয়াতে, যারা অসৎ ও কুকর্ম থেকে তাওবাহ করে ঈমান আনবে তাদের ক্ষমা করে দেওয়াটা একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তিনি ঈমান ও তাওবার কারণে পাপগুলোকে শুধু ক্ষমাই করে দেন না; বরং তা পূণ্যে রূপান্তরিত করে দেন। পাপগুলোকে তার জন্য উপকারী বস্তুতে পরিণত করে দেন।

অনেক স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে সমস্যায় পড়েন। স্ত্রীর কোনো কিছুই পছন্দ হয় না। সামান্য পান থেকে চুন খসলে অনেকে তাদের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বসেন। তারা মনে করেন, যখন তাকে ভালো লাগে না তখন তার সাথে বসবাস করে সুখের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হবে না। এটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। আল্লাহ তা'আলা এ প্রকৃতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বারণ হতে বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ﴾ [النساء: ١٩]

“আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]

সূরা আন-নূরে বর্ণিত বিষয়টির প্রতি খেয়াল করুন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার অপবাদের ঘটনা ঘটল। মুসলিম সমাজ এ নিয়ে বড় বিপদে পড়ে গেল। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত, ব্যথিত হলেন। এমন একটি অপবাদের ঘটনা না ঘটাই কাম্য ছিল; কিন্তু আল্লাহ বিপজ্জনক এ ঘটনাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার নির্দেশ দিলেন।

তিনি বললেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلۡإِفۡكِ عُصۡبَةٞ مِّنكُمۡۚ لَا تَحۡسَبُوهُ شَرّٗا لَّكُمۖ بَلۡ هُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ﴾ [النور: ١١]

“নিশ্চয় যারা এ অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ১১]

এ রকম শত শত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের শিক্ষা রয়েছে কুরআনের বহু আয়াতে।

দ্বিতীয়ত: হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا».

“মানুষ মূল্যবান ধাতুর ন্যায়, স্বর্ণ-রৌপ্যের মতো। জাহেলী যুগের ভাল মানুষেরা ইসলামী যুগেও ভালো মানুষ। যদি তারা বুঝে।” (সহীহ মুসলিম)

দেখুন! এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে মানুষের ব্যাপারে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। মানুষকে তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায় মূল্যবান ধাতু বলে উল্লেখ করেছেন।

কখনো কখনো মানুষের জীবনে বিপদ আসে। অধিকাংশ মানুষ বিপদকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে। আবার যখন সুখের দিন আসে মানুষ সেটাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন, সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থাই মানুষের জন্য ইতিবাচক। প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ঈমানদারের বিষয়টি আশচর্যজনক। তার সকল কাজই কল্যাণকর। ঈমানদার ছাড়া অন্য কোনো মানুষের এ সৌভাগ্য নেই। তার যদি আনন্দ বা সুখকর কোনো বিষয় অর্জিত হয়, তাহলে সে আল্লাহর শোকর করে, ফলে তার কল্যাণ হয়। আর যদি তাকে কোনো বিপদ-মুসীবত স্পর্শ করে, তাহলে সে ধৈর্য ধরে, এতেও তার কল্যাণ হয়।” (সহীহ মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন,

«لا تحقرن من المعروف شيئا».

“যা কিছু ভালো, তা যত ছোটই হোক, তুমি কখনো তা অবমূল্যায়ন করো না।”

দেখুন কীভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব বিষয়কে নিজের জন্য ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ঈমানদারদের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

আরো একটি চমৎকার উদাহরণ দেখুন!

আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين». رواه أبو داود والنسائي

"দু ব্যক্তি সফরে গেল। সালাতের সময় যখন উপস্থিত হলো, তখন তাদের কাছে অজু করার মতো পানি ছিল না। উভয়ে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল। এরপর পানি পেল। তখন একজন অজু করে সালাত পুনরায় আদায় করল। অন্যজন পুনরায় সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকল। এরপর উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে ঘটনার বিবরণ দিল। যে সালাত পুনরায় আদায় করল না, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি সুন্নাত মতো কাজ করেছ। তোমার সালাত আদায় হয়েছে।" আর যে পুনরায় সালাত আদায় করেছে তাকে তিনি বললেন, "তোমার জন্য আছে দ্বিগুণ পুরস্কার।"

দেখুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের ব্যাপারে কীভাবে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত দিলেন। অথচ উভয়ে ছিল পরস্পর-বিরোধী অবস্থানে। আমরা এ অবস্থা দেখে কোনটা সঠিক মন্তব্য করতে না পারলেও বলতাম, অবশ্যই একটি সঠিক হবে, আর অন্যটি হবে ভ্রান্ত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়টিকেই স্বীকৃতি দিলেন। আর সঠিক কোনটি তার প্রতি ইঙ্গিতও করলেন। দাওয়াত-কর্মী ও আলেমদের, এ বিষয়টি রাসূলের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা খুবই জরুরি।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একশ মানুষ খুন করার তাওবাহ সম্পর্কিত একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে দেখা যায় যে, খুনী ব্যক্তি নিরানব্বই জনকে খুন করার পর একজন আবেদকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমার তাওবা করার সুযোগ আছে কি না?' উত্তরে সে বলেছিল, "তাওবার সুযোগ নেই।" অতঃপর তাকেও সে খুন করল। পরে একজন আলেমকে খুনীব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, "তাওবা করার সুযোগ আছে কি না।" সে বলল, হাঁ, তাওবার সুযোগ আছে। দেখা গেল প্রথম জনের উত্তর ছিল নেতিবাচক আর দ্বিতীয়জনের উত্তর ছিল ইতিবাচক। দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তরটি আল্লাহর কাছে সঠিক ছিল।

ইজতেহাদ বা গবেষণানির্ভর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিভঙ্গি দেখুন। তিনি বলেছেন, গবেষক যদি গবেষণায় ভুল সিদ্ধান্ত দেন তাহলে তার জন্য পুরস্কার একটি। আর যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান তা হলে তার পুরস্কার দুটি। ইজতিহাদ বা গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি কত বড় ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। প্রথমত তিনি গবেষণাকে উৎসাহিত করেছেন, দ্বিতীয়ত সঠিক ও নির্ভুল গবেষণা করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি যদি বলতেন, "সাবধান, গবেষণা একটি কঠিন কাজ। তোমরা যারা ইজতিহাদ করবে তারা যদি ভুল করো তাহলে কঠোর আযাব দেয়া হবে।" তাহলে আমরা বলতাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থই বলেছেন।

আর এভাবে বললে, কোনো কিছু নিয়ে মানুষ গবেষণা করতে উৎসাহ পেত না। কিন্তু তিনি ছিলেন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। এ জাতীয় উদাহরণ হাদীসে বহুল পরিমাণে পাওয়া যাবে।

**নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে ইতিবাচকে পরিণত করার দৃষ্টান্ত:**

উহুদের যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। এ কারণে মদীনাবাসীর হৃদয়ে উহুদ পাহাড় সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকালে যুদ্ধে তাদের দুরবস্থার কথা মনে পড়ে যেত। মনে পড়ে যেত যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া আপনজনদের কথা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের এ নেতিবাচক ধারণা পাল্টে দিলেন। তিনি বললেন, "উহুদ আমাদের ভালোবাসে আমরাও উহুদকে ভালোবাসি।"

মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তার কোনো আপনজন মারা যায় তখন তা তার জন্য এক বিশাল বিপদ হয়ে দেখা দেয়। এ অবস্থায় মানুষ যাতে নৈরাশ্যে আক্রান্ত না হয়, বরং আশায় বুক বাঁধে, এ অবস্থাতেও ইতিবাচক সৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে যায় তার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। যখন কারো বিপদ আসে তখন সে বলবে,

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللَّهُمَّ أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها

"আমরা আল্লাহর জন্য এবং তার কাছেই ফিরে যাব। হে আল্লাহ! এ বিপদে আমাকে আপনি পুরস্কার দান করুন। আর এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু আমাকে দিন।" তাহলে তার চলে যাওয়া বিষয় থেকে উত্তম নি'আমত আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করবেন।

দেখুন, কীভাবে তিনি একটি নেতিবাচক অবস্থানকে সম্পূর্ণ ইতিবাচকে পরিণত করার ব্যবস্থা দিলেন।

আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখুন! সহীহ হাদিসে এসেছে,

«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع قبيحا غيره، فمر على قرية يقال لها عفرة فسماها خضرة».

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খারাপ কোনো নাম শুনতেন তখন তা পরিবর্তন করে দিতেন। তিনি এক গ্রামের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন যার নাম ছিল 'আফরাহ' (ধুলায় ধুসরিত) তিনি গ্রামের নামটি পরিবর্তন করে নতুন নাম দিলেন 'খাদরাহ' (সবুজ-শ্যামল)"। (তাবরানি: ৩৭১/১)

আমরা দেখি যখন কোনো নদীতে লঞ্চ ডুবে যায় বা ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় তখন অনেকে নদীকে গালি দেয়, বলে রাক্ষুসে নদী! ঝড়কে গালি দেয়, বলে সর্বনাশী সিডর ইত্যাদি। এটা একটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। এটা পরিবর্তন করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা বাতাসকে গালি দেবে না। তোমরা যুগ বা সময়কে গালি দেবে না। তোমরা মোরগ-মুরগীকে গালি দেবে না। কোনো বস্তু বা বিষয়কে তোমরা কুলক্ষণ মনে করবে না। সবকিছুকে সুলক্ষণ মনে করা আমার কাছে প্রিয়। এভাবে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে ইতিবাচকে পরিণত করে দেওয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে হাদীস ও সীরাতে রাসূলে।

**ইতিবাচক মুল্যায়নের উপকারিতা:**

অনেকেই আছেন যারা কারো কোনো কাজ বা কীর্তি দেখলে কর্তাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন না করে তা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন, নেতিবাচক দৃষ্টভঙ্গি নিয়ে বিশ্লেষণ করেন। তারা ভালো কাজের স্বীকৃতি দিতে নিরাগ্রহ; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো মধ্যে সামান্য ভালো কাজ দেখলে তা ইতিবাচক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করার সাথে সাথে তার প্রশংসা করতেন। তাকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করতেন। দেখুন! তিনি তার সাহাবীগণের সম্পর্কে বলছেন,

«أفضل أمتي أبو بكر، وأشدهم في الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأقربهم إليَّ زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة : أبو عبيدة عامر بن الجراح».

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবু বকর, আল্লাহর ব্যাপারে সবার চেয়ে কঠিন উমার, সর্বাপেক্ষা লজ্জাশীল উসমান, কুরআন সর্বাপেক্ষা ভালো তিলাওয়াতকারী উবাই ইবন কা'আব, আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি যায়েদ ইবন সাবিত এবং হালাল হারামের ব্যাপারে সর্বাধিক বিজ্ঞ মু'আয ইবন জাবাল। সাবধান! প্রত্যেক জাতির একজন সমধিক বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে আর আমার উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হচ্ছে- আবু উবাইদাহ আমের ইবনুল-জাররাহ্।" [আহমদ ও তিরমিযী]

দেখুন! তিনি এ হাদিসে তার সাহাবীদের কীভাবে ইতিবাচক মূল্যায়ন করেছেন। তাদের প্রশংসা করেছেন। সম্মানজনক উপাধি দিয়েছেন। তিনি সাহাবী আশাজ্জ ইবন আবদে কায়েসকে বলেছিলেন,

«إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة».

"তোমার মধ্যে দুটো গুণ রয়েছে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন। সহিষ্ণুতা ও ধীরস্থিরতা।" (সহীহ মুসলিম)

**কেন ইতিবাচক মূল্যায়ন জরুরি?**

ইতিবাচক দিকের আলোচনা মানুষের মধ্যে সৎকাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে। ব্যক্তিসত্তা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করে। তাকে এ বিশ্বাস করতে শেখায় যে, সে এ সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যাকে যে গুণের কারণে মূল্যায়ন করা হবে সে তার সেই গুণটির গুরুত্ব দেবে। সে বিশ্বাস করবে, আমাকে যখন এর জন্য প্রশংসা করা হয়েছে তখন এটি আমার সম্পদ। এ সম্পদ আমাকে রক্ষা করতে হবে। এর ওপর অবিচল থাকতে হবে। সাথে সাথে সে এর অতিরিক্ত ভালো গুণটি অর্জন করার জন্য আগ্রহ দেখাবে। দেখুন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে আমার উম্মতের মধ্যে দয়ার্দ্র। আর উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে বললেন, সে আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে কঠোর। ফলে উভয়ে চেষ্টা করলেন অন্যের গুণটিকে নিজে আয়ত্ত করতে। তাই আমরা দেখি ধর্মদ্রোহীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের বেলায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কঠোর হয়েছিলেন আর উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হয়েছিলেন দয়ার্দ্র। আবার কারো ইতিবাচক গুণের প্রকাশ্যে মূল্যায়ন করলে বা স্বীকৃতি দিলে যার মধ্যে এ গুণটির অভাব আছে সে এটি অর্জনের জন্য আগ্রহী হয়ে থাকে। যখন মানুষের মধ্যে সকলের ভালো গুণগুলোর ইতিবাচক মূল্যায়নের সংস্কৃতি চালু হয়ে যাবে তখন পরনিন্দা, গীবত, পরদোষ-চর্চা, অপবাদ, গালিগালাজ ইত্যাদি খারাপ আচরণগুলো দূর হয়ে যাবে।

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণের কাউকে উপাধি দিয়েছেন, সাইফুল্লাহ, কাউকে আসাদুল্লাহ, কাউকে তাইয়ার আবার কাউকে আমীনুল উম্মাহ বলে। এগুলো সবই ছিল ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ও ইতিবাচক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন।

**আলেম-ওলামা দাওয়াত-কর্মীদের জন্য এ গুণটির প্রয়োজনীয়তা:**

আমাদের আলেম-উলামা, দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ গুণটি থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হল, তাদের মধ্যেই এ গুণটির অভাব সবচেয়ে বেশি। তিনটি উদাহরণ দিচ্ছি:

এক. আমি একটি মসজিদে জুমু'আর সালাত আদায় করলাম। দেখলাম খতীব সাহেব খুৎবাহপূর্ব বক্তৃতার এক পর্যায়ে বললেন, আজকাল অনেক মৌলভীকে দেখা যায় টেলিভিশনে আলোচনা করতে। এরা সব কমার্শিয়াল মৌলভী। এরা পলিটিক্সবাজ।

এখানে তিনি যে সকল আলেম টিভিতে আলোচনা করেন তাদেরকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্য মুসল্লীদের শেয়ার করার চেষ্টা করেছেন।

দুই. এক মসজিদে জুমু'আর সালাত পড়ছিলাম। মুহতারাম খতীব প্রথম খুতবা দিলেন বাংলা ভাষায়। পরের খুতবা দিলেন আরবিতে। খুৎবার মধ্যে বললেন, যারা শুধু আরবি ভাষায় খুৎবা দেয় তাদের খুৎবা সঠিক নয়। মানুষে কিছু বোঝে না। সৌদি আরবের সকল আলেম একমত যে, খুৎবা দিতে হবে স্থানীয় ভাষায়। তারা মানুষকে বোঝাতে যেয়ে খুৎবার পূর্বে বাংলাতে আলোচনা করেন। এটা বিদ'আত।

আবার অন্য এক মসজিদে জুমু'আর সালাত আদায় করলাম। খতীব আরবিতে খুৎবা দিলেন। খুৎবাপূর্ব বক্তৃতায় বললেন, দু একজন পণ্ডিত আছেন যারা বাংলা ভাষায় খুৎবা দেন। বাংলা ভাষায় খুৎবা দেওয়া বিদ'আত। বাংলায় খুৎবা দিলে খুৎবা আদায় হয় না।

এ ধরনের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন আমরা যদি সেরূপ করতে সক্ষম হতাম, তাহলে বহু সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। অর্থাৎ যদি এরূপ ভাবতে সক্ষম হতাম যে, যে ব্যক্তি আরবিতে খুৎবা দেওয়া জরুরি মনে করছে সেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করছে, কেননা রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবি ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় খুৎবা দেন নি। আর যে ব্যক্তি মাতৃভাষায় খুৎবা দেওয়ার প্রতি জোর দিচ্ছে সেও রাসূলুল্লাহর সুন্নাতের বিরুদ্ধে যায় নি। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় খুৎবা দিতেন না।

তিন. হকপন্থি জনৈক আলেমের আত্মীয় তাবলীগ জামা'আতের সাথে সময় লাগাতে বের হয়েছেন, তিনি সময় লাগাতে গেলেন জয়পুরহাটে। যে মসজিদে জামা'আতটি অবস্থান নিল তার ইমাম ছিলেন আহলে হাদীসের জনৈক আলেম। আত্মীয় লোকটি মোবাইলে উল্লিখিত আলেম-আত্মীয়ের কাছে একটি মাস'আলাহ জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, যে মসজিদে আমরা সালাত পড়ি তার ইমাম সাহেব আহলে হাদীসের লোক। তাই আমীর সাহেব বলেছেন, তাদের পিছনে সালাত হবে না। তাদের পিছনে সালাত পড়লে সালাত ঘুরিয়ে পড়তে হবে। প্রশ্ন হলো, আমীর সাহেবের কথা কি ঠিক? আমাদের সালাত কি দ্বিতীয়বার ঘুরিয়ে পড়তে হবে?

উত্তরে বলা হলো, না, দ্বিতীয়বার পড়তে হবে না। আহলে হাদীসের ইমামের পিছনে সালাত পড়লে তা অবশ্যই শুদ্ধ হবে। সে বেচারা এ কথা আমীর সাহেবকেও বললেন। আমীর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কে বলেছে এ মাস'আলাহ? তিনি বললেন, আমার অমুক আত্মীয়। সে আলেম। একটি গবেষণা সংস্থায় কাজ করে। আমীর সাহেব বললেন, তাদের পিছনেও সালাত হয় না। তারাও এ দলের লোক।

প্রিয় পাঠক! দেখুন! এত বড় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কীভাবে দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব? যারা দাওয়াত, তাবলীগ ও তালিমের কাজ করেন -তাদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন? তিনি বলেছেন,

«يسروا و لا تعسروا و بشروا و لا تنفروا».

“তোমরা সহজ করো কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও। ঘৃণা সৃষ্টি করো না।” (আহমদ ও বায়হাকি)

আমাদের ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার এত বেশি যে, নতুন কোনো কিছু দেখলে তা কীভাবে হারাম ঘোষণা করা যায় সে প্রচেষ্টা শুরু করে দেন। এটাকে ইতিবাচক হিসেবে নিয়ে তা কীভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়, শুরুতে তারা সে কথা ভাবতেই পারেন না। আর যখন ভাবতে শুরু করেন, তখন সময় তাদেরকে পিছনে রেখে এগিয়ে যায় দূরে বহু দূর। শুধু তাই নয় বরং দেরী করে হলেও যখন কেউ চিন্তা শুরু করে সচেতনতার পরিচয় দেন, তখন আলেমদের অন্য একদল তাদের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করতে থাকেন। তাদের ইতিবাচক চিন্তা ও কর্মও হয় বাধাগ্রস্ত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের পর খেজুর গাছে পরাগায়ন করাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন ফলন কম হল তখন তিনি আবার তা করার অনুমতি দিলেন। কারণ মতামতটি ছিল তার ব্যক্তিগত। তাই আলেম ওলামা, ইসলামের দাওয়াত-কর্মী সকলকে বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত। মানুষকে কাছে টানতে হলে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে ইসলামের আলোকে ইসলামের স্বার্থে। তবে তা করতে হবে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে। কুরআন ও হাদীস যা স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে সেখানে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের নামে তা হালকা করে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীস বাদ দিয়ে অন্য কারো মতবাদ, তরিকা অবলম্বন করা হল ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির একটা বড় অন্তরায়।

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হল মুনাফিকদের স্বভাব যারা মুনাফিক তারা সকল কিছু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে থাকে। কুরআনে এর বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তারা সকল আওয়াজকে নিজেদের বিরুদ্ধে বলে ভাবে।”

এমনকি আমরা অনেক সময় বলে থাকি মুসলিমগণ খারাপ হয়ে গেছে, তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে। কথাটি সঠিক হলেও মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الخير فيَّ وفي أمتي إلى يوم القيامة».

“আমি এবং আমার উম্মতের মধ্যে কিয়ামত অবধি কল্যাণ বিদ্যমান থাকবে।”

সমাপ্ত